ছোটদের
শরৎচন্দ্র
ছোটদের শরৎচন্দ্র

ছোটদের মহামানুষ রচনামালা : তুই
ছোটদের
শরৎচন্দ্র
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

ছোটদের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ঃ কুঁড়ি ॥

দেবানন্দপুর গ্রাম হুগলী জেলায়। ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে। একদিন সে অঞ্চলের খুব সমৃদ্ধি ছিল। দেবানন্দপুরের কয়েক মাইল দূরে পুরাতন সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী সপ্তগ্রাম। সওদাগরী ডিঙিভরা সে সরস্বতী নদীও আর নেই, সে যুগের সেরা বাণিজ্য-কেন্দ্র সে সপ্তগ্রামও আর নেই! ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সে অঞ্চলের সব শ্রী ও ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে গেছে। দেবানন্দপুর এখন একখানি বনে জঙ্গলে ভরা গণ্ডগ্রাম। সেই গ্রামে মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মামার বাড়িতে মানুষ হন। পরে মামার বাড়ির সম্পত্তির অধিকারী হয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধেন। দেবানন্দপুরে ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর (১২৭৩ সালের ৩১ ভাদ্র) তারিখে মতিলালের বড় ছেলে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্রের মায়ের নাম ছিল শ্রীমতী ভুবনমোহিনী।

ভুবনমোহিনীর বাবা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন হালিশহরের অধিবাসী। চাকরির জন্য সপরিবারে বাস করতেন ভাগলপুর শহরে। শরৎচন্দ্রের যখন দু'তিন বছর বয়স, তখন

মতিলাল স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাগলপুরে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। তখনকার দিনে তিনি কলেজে এফ. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। সে যুগে ভাল চাকরি পাওয়া তাঁর মত ইংরেজী শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটি শিল্পী প্রকৃতির মানুষ। যেমনি খেয়ালী, তেমনি অসাংসারিক। সংসারে টাকাকড়ি উপায় করে দশজনের একজন হবেন—এদিকে তাঁর কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। ভুবনমোহিনী ছিলেন খুব গোছালো, সাদাসিধা, সরল প্রকৃতির মেয়ে। বাপমায়ের সংসারে কঠোর পরিশ্রম করে সকলকে সেবাযত্ন করতেন। তাই বাড়ির সবাই তাঁকে ভালবাসতেন। শরৎচন্দ্রেরা সকলে ছিলেন ছয় ভাই আর দুই বোন। শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন তিন ভাই আর দুই বোন।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রের স্বভাব ছিল ঠিক রবীন্দ্রনাথের বিপরীত। ছোট রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঘরকুণো, ভাবুক প্রকৃতির। কিন্তু কথাশিল্পী ছিলেন দুরন্ত আর খামখেয়ালী। ছোট বয়সে তাঁকে দেখতে ছিল রোগা, ছিপছিপে, কাল। পা দুটি সরু সরু, তাতে ছিল হরিণের মত ক্ষিপ্রতা। তিনি খুব দৌড়তে পারতেন। তাড়াতাড়ি গাছে চড়ার কাজেও খুব দক্ষ ছিলেন। চেহারার মধ্যে লক্ষ্য করবার ছিল দুষ্টুমিভরা প্রখর বুদ্ধির আলোয় জ্বলজ্বলে চোখ দুটি। দুষ্টুমির জন্য মামার বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে তিনি ছিলেন দলের সর্দার। সকলেই তাঁকে মানত, ভয় করত, ভালবাসত। বাড়িতে ছিল একটা ভাল পেয়ারা গাছ। তাতে ফলত অজস্র ফল। চাকরদের উপর বাড়ির কর্তাদের কড়া হুকুম ছিল, ছেলেরা যেন পেয়ারা গাছে হাত না দেয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে আটকায় কে!

তিনি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায়ই পেয়ারা পেড়ে আনতেন। নিজে খেতেন, দলের সকলকে বিলোতেন। ছোট বয়সে তাঁর খুব প্রিয় শখ ছিল ফড়িং পোষা। রাজা ফড়িং, গঙ্গা ফড়িং, গাধা ফড়িং—তিনি বিচিত্র ফড়িং ধরে সযত্নে তাদের বাক্সে রেখে খাওয়াতেন। এক এক জাতের ফড়িং এক এক রকম খাবার ভালবাসে। শরৎচন্দ্র পরম আগ্রহভরে কারুর জন্যে আনতেন আকন্দ পাতা, কারুর জন্য ঘাস, কারুর জন্য অন্য কিছু। তিনি শখের জন্য পাখিও পুষতেন। একবার একটা গাঙশালিখ ধরে আদরযত্ন করে খুব পোষ মানিয়েছিলেন। তাঁর ছিল একটা বুড়ো কোকিল, সেটা কিছুতেই কথা বলত না। একদিন শরৎচন্দ্র হটাৎ সঙ্গীদের বললেন, আদার রস খেলে যেমন মানুষের গলা খোলে, কোকিলদের তেমনি আমপাতার রস খাওয়াতে হয়। সমবয়সী মামা ও বন্ধুরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের কাছে সর্দারের কথা ছিল যেন বেদবাক্য। শরৎচন্দ্রের নির্দেশে সকলে মিলে বুড়ো কোকিলটাকে জোর করে চেপে ধরে ঢক্ ঢক্ করে খাওয়ালেন আমপাতার রস। কয়েক ঘণ্টা পরে সেই অভিনব ওষুধের ফল ফলল। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। শরৎচন্দ্র বিছানায় শুয়ে শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে ভাবছেন, এই বুঝি কোকিলটা ডাকে। কিন্তু তার ডাক আর শোনা গেল না! সকাল হতে সবাই ছুটে গেল খাঁচার কাছে। গিয়ে দেখলে, পাখিটা খাঁচার উপর ঠ্যাং উল্‌টে মরে আছে।

শরৎচন্দ্রের নবীন মন সদাই অনুসন্ধিৎসায় ভরা থাকত। তিনি স্বভাবতঃই সব জিনিস নিজে পরীক্ষা করে জানতে চাইতেন, বুঝতে

চাইতেন, মীমাংসা করতে চাইতেন। একদিন হঠাৎ কি একখানা বই থেকে জানতে পারলেন, বেল গাছের শিকড় ফণা-তোলা সাপের মুখে ধরতে পারলে সাপ তখনই ফণা নীচু করে নিস্তেজ হয়ে যায়। তিনি সঙ্গীদের ডেকে বললেন, চল্ একদিন পরীক্ষা করে দেখি। চার পাশের বন-জঙ্গলের গর্তে গর্তে সাপ খোঁজা শুরু হল। খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পাওয়া গেল একটি গর্তে গোখরো সাপ রয়েছে। শরৎচন্দ্র আগ্রহভরে এগিয়ে গিয়ে ধরলেন তার মুখে বেলের শিকড়। গোখরোর বাচ্ছা ফণা তুলে সজোরে সেই শিকড় খণ্ডের উপর ছোবল মারলে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে বাড়ির অভিভাবকেরা চাকরদের সঙ্গে নিয়ে ছুটে এলেন, আরে রোক্, রোক্, রোক্। সাপের কামড়ে শরতের বুঝি আজ প্রাণটা যায়! শেষে চাকরদের লাঠির ঘায়ে সাপটা মারা পড়ল। ছোটবেলা থেকে আজীবন শরৎচন্দ্রের মনে সাপের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল।

গাঙ্গুলি বাড়ির কর্তাদের ধারণা ছিল, ছেলেদের উচিত শুধু সারাক্ষণ পড়াশুনা করা আর ভালমানুষের মত বাড়িতে চুপচাপ থাকা। খেলাধূলা, দৌরাত্ম্য তো কুশিক্ষার সামিল; তাতে শুধু সময় আর শক্তি মিছামিছি নষ্ট হয়। তাঁরা মনে করতেন, বাড়ির ছেলেমেয়েদের পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিলে কুসঙ্গে পড়ে অসৎ হয়ে যাবে। মামার বাড়িতে এই বন্দীজীবনের পরিমণ্ডলে থেকে প্রাণচঞ্চল কিশোর শরৎচন্দ্র যেন হাঁপিয়ে উঠতেন। তিনি বাড়ির বাধা নিষেধ মেনে কিছুতেই চলতে পারতেন না। সুযোগ পেলেই খেলার আড্ডা জমাতেন। বাইরে গিয়ে বন্ধু-

বান্ধবদের সঙ্গে মিশতেন। বাড়ির অভিভাবকেরা তাই তাঁর উপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরও অন্তরে ঘনিয়ে উঠত বাড়ির কর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাব।

শরৎচন্দ্রের খেলাধূলা এবং দুষ্টুমিতে মন ছিল বটে, কিন্তু তা বলে পড়াশুনায় অমনোযোগ ছিল না। তাঁর যখন দশ এগার বছর বয়স, বাড়ির অভিভাবকেরা তাঁকে একরকম জোর করেই ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে ভরতি করে দিয়েছিলেন। ভাগলপুরে ছাত্রবৃত্তি তখন ছিল বেশ কঠিন পরীক্ষা। এত অল্প বয়সে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য। শরৎচন্দ্র একথা ভেবে ভয় পেয়ে গেলেন। কঠোর পরিশ্রম করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাঁর আগ্রহ দেখে অভিভাবকেরা বাড়িতে পড়াবার জন্য একজন পণ্ডিত মশাইকে নিযুক্ত করলেন। গৃহশিক্ষকের একান্ত চেষ্টা এবং শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য অসম্ভব সম্ভব হল। যথা সময়ে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

কিশোর বয়স থেকে শরৎচন্দ্রের ঘরের জীবন ছিল পরিপাটী,—পরিচ্ছন্নতায় সুন্দর। তিনি পড়ার বইগুলি সদা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে রাখতেন। কালি-ফেলা, ময়লা, মোড়া-দোমড়ানো, ছেঁড়া-জোড়া বই বা খাতা দেখলে তাঁর মনে বিরক্তির উদ্রেক হত। ব্যবহারের পর তাঁর দোয়াত-কলম, পেন্সিল, ছুরি প্রভৃতি জিনিস পরিপাটী করে টেবিলে সাজানো থাকত। শেষ বয়সেও তাঁর এই অভ্যাস ছিল।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পর শরৎচন্দ্র ইংরেজী স্কুলে ভরতি হলেন। এই সময় হঠাৎ তাঁর বাইরের বই পড়ার দিকে খুব ঝোঁক যায়। তাঁর বাবা মতিলাল বই পড়তে ভালবাসতেন। তিনি বাইরে

থেকে বা স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে নানা বই সংগ্রহ করে বাড়িতে আনতেন। শরৎচন্দ্র লুকিয়ে লুকিয়ে সেই সব বই পড়ে শেষ করতেন। মতিলালের বই লেখারও ঝোঁক ছিল। তিনি মাঝে মাঝে খেয়ালের বশে লিখতে শুরু করতেন। কিন্তু কোন বই-ই শেষ করার মত ধৈর্য তাঁর থাকত না। বাবাকে বই লিখতে দেখে কিশোর শরৎচন্দ্রের মনে সাহিত্য রচনার ইচ্ছা জাগে। তিনি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ ও ছোট গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। এ সময় তাঁর ম্যাপ আঁকার প্রবল শখ জাগে। তিনি প্রতি রবিবার দুপুরে ম্যাপ আঁকতে বসতেন। বাড়িতে থাকত অভিভাবকদের নক্সা আঁকার যন্ত্রপাতি। তিনি লুকিয়ে সেই যন্ত্রপাতি সরিয়ে আনতেন। শিমপাতা, হলুদ, শিউলিপাতা প্রভৃতি দিয়ে নানা রং তৈরি করতেন। তারপর সযত্নে ম্যাপ আঁকার কাজে মন দিতেন। ছোটবেলার এই অভ্যাস থেকে হয়ত তিনি ভবিষ্যতে ছবি আঁকবার দক্ষতা পেয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের খুব ভালবাসতেন। তাঁদের সংসর্গে খুব আনন্দ পেতেন। তবু বন্ধুবান্ধবদের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একাকী ছিল এই ডানপিটে ছেলেটির মন। ছোটবেলা থেকে কি যেন একটা রহস্যময় অনুভূতি তাঁর হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছিল গাছপালা, নদী, আকাশ, প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীর আকর্ষণ। ভাগলপুরে তাঁদের পাড়ায় ছিল একটি ভাঙা প'ড়ো বাড়ি। সেই বাড়ির উত্তর দিকে গঙ্গার তীরে একটুখানি জায়গা ঘিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল কয়েকটা নিম আর দাঁতরাঙা গাছ। নিমের গোলঞ্চ, মদনের কাঁটালতা চারিদিক থেকে নির্জন জায়গাটিকে

এমন করে ঘিরেছিল যে দিনের বেলাতেও মানুষ সেখানে ঢুকতে ভয় পেত। শরৎ প্রায়ই সেখানে গিয়ে একখানা পাথরের উপর বসে আপন মনে খরস্রোতা গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতেন। একদিন একজন সমবয়সী মামা সেই জায়গাটির সন্ধান পেয়ে কিছুতেই শরৎকে ছাড়লেন না। তাঁর পিছু পিছু এলেন। তিনি সব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কি কর শরৎ ?

শরৎ বললেন, এই পাথরের ওপর বসে বসে আমি সব বড় বড় কথা ভাবি। এই আমার তপোবন।

এদিকে বাড়ির লোকেরা যতই তাঁর দুষ্টুমিতে বিরক্ত হোক, তিনি পড়াশোনায় সকলকে অবাক্ করে দিলেন। ইংরেজী বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এত বেশি নম্বর পেলেন যে, কর্তৃপক্ষ তাঁকে দু'ক্লাশ উপরে তুলে দিলেন। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ ঘটল বিড়ম্বনা। শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে মতিলালের মনান্তর হল। তিনি ভাগলপুর থেকে সপরিবারে দেবানন্দপুর চলে এলেন। তখন শরৎচন্দ্রের বয়স প্রায় বার তের বছর। তাঁর পড়াশোনায় অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর বাধা পড়ল।

মতিলালের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তিনি দেবানন্দপুরে এসে প্রাণপণে চাকরির সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু সংসারী হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। কপালদোষে তাঁর আলুথালু চেষ্টার কোন ফল হল না। তাই সংসারে অভাব ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। শরৎ গ্রামের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রথম প্রথম পাড়াগাঁয়ে এসে নানা ডানপিটেমি করে তাঁর দিন

কাটতে লাগল। শোনা যায়, তাঁদের বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের ঘন ঘন ধূমপানের অভ্যাস ছিল। তিনি পড়ানো শুরু করার আগে পর পর কয়েকটি কল্‌কেয় তামাক সেজে রেখে দিতেন, যাতে ছাত্রদের পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে একটিতে আগুন ধরিয়ে বারবার তামাক খেতে পারেন। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মশাই-এর এই বিলাস আড়চোখে রোজই লক্ষ্য করেন। তিনি একদিন সুযোগ বুঝে কল্‌কেগুলো থেকে তামাক ফেলে দিয়ে তার বদলে টুকরো টুকরো ঢিল ভরতি করে উপরে টিকে সাজিয়ে রেখে দিলেন। গুরুমশাই যথাসময়ে পড়া আরম্ভ করে একটি কল্‌কেয় আগুন ধরালেন। কিন্তু যত চেষ্টা করেন তবু তা থেকে কিছুতেই ধোঁয়া বার হয় না! এদিকে ছাত্রেরা মুখ চেপে মুচকি হাসতে শুরু করে দিয়েছে। পণ্ডিত মশাই তখন ব্যাপার বুঝতে পেরে রাগে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ হতভাগা এ কাজ করেছে রে? প্রথমে কেউ জবাব দিলে না। শেষে একজন শরৎকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে। পণ্ডিতমশাই বেত হাতে তেড়ে এলেন। শরৎ তখন হরিণের মত ক্ষিপ্রগতিতে চম্পট দিয়েছিলেন। পরের দিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে পাওয়া গেল পাশের গ্রামের এক বাড়িতে।

আর একদিন শরৎচন্দ্র খেলা করতে করতে দেখতে পেলেন, দূরে রেলগাড়ি আসছে। তিনি হঠাৎ বন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন রেল লাইনের মাঝখানে। তারপর হাতের লাল ছাতিটা খুলে দেখাতে লাগলেন। গাড়িখানা কাছে এসে হুস হুস শব্দে থেমে গেল। শরৎ তখন হি-হি করে হাসতে হাসতে লুকিয়ে পড়লেন পাশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে।

ক্রমে বাড়ির দুর্দশা গুরুতর হয়ে উঠল। মতিলালের স্ত্রী খুব গোছালো মানুষ ছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম নানা ফিকির করে সংসার চালাতে লাগলেন। তারপর একে একে জমিজায়গা বাঁধা পড়তে লাগল। শেষে মতিলাল নিরুপায় হয়ে স্ত্রীর গয়না বেচতে শুরু করলেন। অভাবের তাড়নায় বাড়িতে নিত্য বাড়তে লাগল অকারণ ঝগড়া। শরৎ তা দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। গভীর প্রকৃতির ছেলেদের মন স্বভাবতঃই সূক্ষ্মবোধে তীক্ষ্ণ এবং স্পর্শকাতর হয়। অবসাদে তাঁর মন ভেঙে পড়ল। ক্রমে এমন অবস্থা হল যে মতিলালের পক্ষে ছেলের বিদ্যালয়ের মাইনে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। খেয়ালী শরৎ মনের দুঃখে তখন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মামার বাড়িতে তাঁর চলাফেরার উপর অভিভাবকদের শ্যেন দৃষ্টি ছিল। তিনি দেবানন্দপুরে পেলেন অবাধ স্বাধীনতা। তার ফলে শরৎ নিজেকে বিপথে হারিয়ে ফেললেন। বাড়িতে নিত্য অশান্তি আর অভাব। তাঁর নিজের অন্তরে বাপ-মার উপর তীব্র অভিমান আর নিষ্ঠুর অদৃষ্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঘনিয়ে উঠেছিল। তিনি লেখাপড়া ছেড়ে যাত্রাদলে যোগ দিলেন। কখন-বা অশিক্ষিত গেঁয়ো লোকদের আড্ডায় আড্ডায় তাঁর দিন কাটতে লাগল। একবার খেয়াল বশে পালিয়ে গেলেন পুরীতে। আর একবার নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হয়ে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে রেলগাড়িতে চড়লেন। কামরাটা ছিল প্রথম শ্রেণীর। সেই কামরায় একজন কলকাতার বিখ্যাত এ্যাটর্নি ছিলেন। পশ্চিম অঞ্চল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি ছেঁড়া, ময়লা কাপড়জামা-পরা, রুক্ষ-চুল, শুকনো-মুখ ছেলেটিকে দেখে সস্নেহে

কাছে বসালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবে? শরৎ উত্তর দিলেন, কলকাতায় যাব। কথায় কথায় ভদ্রলোক শরতের পরিচয় জানতে পারলেন। শরতের একজন দূর সম্পর্কের দাদামশাই ভদ্রলোকের বন্ধু ছিলেন। তিনি বাড়ি-থেকে-পালানো ছেলেটিকে নিজের সঙ্গে বাড়ি নিয়ে গিয়ে শেষে বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এইভাবে কঠোর দারিদ্র্য ও চরম দুর্দশার মধ্যে মতিলালদের কয়েক বছর কেটে গেল। তারপর সর্বস্বান্ত হয়ে একদিন আবার তিনি সপরিবারে ভাগলপুরে ফিরে এলেন। তখন ১৮৮৬ সাল। মামার বাড়ির কর্তারা শরৎচন্দ্রকে তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর ভাগলপুরের সঙ্গীরা এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে পড়ছিলেন। শরৎচন্দ্র তবু নিরুৎসাহ হলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ পরীক্ষা দেবার কথা। তিন বছরের বাকী পড়া এই কয়েকমাসের মধ্যে তৈরি করে নিতে হবে। শরৎচন্দ্র সেই অসাধ্য সাধনের জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। মামার বাড়ির একপ্রান্তে ছিল একখানি নিরালা পূজার ঘর। একগুঁয়ে ছন্নছাড়া ছেলেটি সেই ঘরে বাসা বাঁধলেন। একটি ছোট টেবিল, একখানি দড়ির খাট। খাটের তলায় তামাকের কল্‌কে আর গুড়গুড়ি। আর এককোণে একটি ষ্টোভ আর কফির টিন। দোরের বাইরে একটি খোঁটাতে বাঁধা থাকত তার প্রিয় বেঁজি। শরৎ কফি খেয়ে রাত জেগে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতেন। একদিন তিনি অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে বেঁজিটিকে ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়েছেন। সকালে উঠে দেখতে পেলেন গায়ের

কাপড়খানা রক্তে লাল। ভাবলেন, ঘরে বড় ইঁদুরের উৎপাত, বেঁজি হয়ত একটা বড় ইঁদুর মেরেছে, তারই রক্ত। তারপর ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখেন, মেঝের উপর পড়ে আছে একটা সাপ। সেদিন পোষা বেঁজিটা না থাকলে হয়ত তাঁর মরণ কেউ আটকাতে পারত না।

১৮৯৪ সাল। শরৎচন্দ্র এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে এফ-এ শ্রেণীতে পড়া আরম্ভ করলেন। তাঁর চরিত্রে একদিকে ছিল স্বেচ্ছাচারিতার উপর ঝোঁক আর একদিকে গভীর সংযম। তিনি খাওয়া ও ঘুম সম্বন্ধে বড় সচেতন ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, বেশি খেলে আর বেশি ঘুমুলে মানুষের বুদ্ধি কমে যায়। যাদের প্রকৃতি সূক্ষ্ম নয়, তারাই স্থূল জানোয়ারে মত গোগ্রাসে খেতে ভালবাসে আর দিনরাত ঘুমে বিভোর হয়ে থাকতে চায়। শরৎচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই কম খেতেন, দুপুরে ঘুমুতে ভালবাসতেন না। বেশি রাত পর্যন্ত জাগাও তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল।

শরৎচন্দ্র এনট্রেন্স পরীক্ষা দেবার পর থেকে কলেজে ভর্তি হবার আগে পর্যন্ত কয়েকমাস ছুটি পেলেন। এই সময়ে তাঁর মনের খেয়ালিপনা আবার উদ্দাম হয়ে ওঠে। রাজু নামক এক বন্ধু তাঁর এইসব খেয়ালিপনার গুরু হন। রাজু ছিলেন ভাগলপুরের এক বিখ্যাত বাঙালী পরিবারের ডানপিটে ছেলে। তাঁর অন্যান্য ভাইরা সকলেই সংসারে কৃতী ছিলেন। তিনি কেবল হয়ে উঠেছিলেন খাপছাড়া। তাঁর একটি ডিঙি ছিল। শরৎ এক একদিন তাঁর সঙ্গে ডিঙি চড়ে গঙ্গায় ভেসে যেতেন—নিরুদ্দেশ

যাত্রায়। তাঁরা যে কোথায় চলেছেন তা কেউ জানত না। রাত একপ্রহর শেষ হয়ে যেত। তবু বাড়ির লোকে তাঁদের খোঁজ পেতেন না। কখন-বা শরৎ রাজুর সঙ্গে দিনভোর বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। কখন-বা পাড়াপড়শীর বাগানে লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক খেতেন আর আড্ডা দিতেন। রাজুর শুধু কু-কাজে আগ্রহ ছিল না,—সমাজসেবা, পরোপকার প্রভৃতি ভাল কাজেও ছিল প্রচুর উৎসাহ। শরৎ রাজুর সংসর্গে সে সব কাজেও মেতে উঠতেন। তিনি রোগীর পরিচর্যা এবং শবসৎকারের কাজে ছিলেন সবার অগ্রণী। জন্ম থেকেই তাঁর ছিল মধুর সুরালা কণ্ঠস্বর। রাজুর সংস্পর্শে এসে তাঁর গান-বাজনা ও অভিনয়ের উপর স্বাভাবিক ঝোঁক নেশায় পরিণত হয়। মামার বাড়ির কর্তারা গান-বাজনা-অভিনয়ের উপর ভীষণ চটা ছিলেন। তাঁরা শরৎচন্দ্রকে কঠোরভাবে নিবৃত্ত করতে চাইতেন। কিন্তু বিদ্রোহী শরৎচন্দ্র তাঁদের কোন শাসনই মানতেন না। তাই, বোধ হয়, তাঁরা দৌহিত্রের উপর উত্তরোত্তর বিরূপ হয়ে উঠছিলেন।

কলেজে ভর্তি হবার পর হঠাৎ আপনা থেকেই শরতের জীবনে পরিবর্তন এল। তিনি নতুন উৎসাহভরে পড়াশোনায় মন দিলেন। কয়েকমাস পরে পরীক্ষার দিন এল। বিজ্ঞান পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি বাড়ির ছেলেদের ডেকে বললেন, কাল আমার বিজ্ঞান পরীক্ষা। আজ আর তোমাদের পড়া বলে দিতে পারব না। আমাকে রাত জেগে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে হবে। আমাকে ডেকে যেন তোমরা কেউ বিরক্ত করো না। তারপর তিনি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বিজ্ঞানের বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে

দিলেন। পরের দিন সকালবেলা ছেলেরা দোর ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখে, তখনও আলো জ্বলছে আর শরৎ একাগ্র মনে বই পড়ছেন। তিনি ছেলেদের দেখে বই থেকে মুখ না তুলেই বিরক্তিভরে বললেন, এইমাত্র তোমাদের বললুম না, আমাকে আজ রাতে বিরক্ত করো না, তবু এলে? ছেলেরা তো অবাক। তারা বললে, সে তো কাল সন্ধ্যেবেলার কথা! এখন যে ভোর হয়ে গেছে। শরৎ নিবিষ্ট মনে পড়তে পড়তে এমন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন যে, সারারাত কেটে গেছে বুঝতে পারেন নি। সেবার পরীক্ষায় তিনি খুব ভাল নম্বর পেলেন।

এই সময়ে শরতের স্বভাবজাত সাহিত্যানুরাগ প্রবল হয়ে ওঠে। যখন বিদ্যালয়ে পড়তেন তখন থেকেই তাঁর মনে সাহিত্যিক হবার উচ্চাশা জাগে। বাবার অসমাপ্ত রচনাগুলি গোপনে পড়তে পড়তে তাঁর গভীর ইচ্ছা হত, ভবিষ্যতে সেগুলি নিজে লিখে শেষ করে দেবেন। তিনি ভাগলপুরে কলেজে ভরতি হবার পরে কয়েকজন সমবয়সী মামার সহায়তায় "শিশু" বলে একখানি হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি নিজে ছিলেন পত্রিকার প্রধান লেখক। অনেকদিন আগেই তাঁর বঙ্কিম গ্রন্থাবলী প্রভৃতি পড়া শেষ হয়ে গেছল। ইতিমধ্যে একদিন তাঁর এক মামা অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে অন্দরমহলে সকলকে জড়ো করে রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধ" কাব্যখানি পড়ে শোনালেন। শ্রোতাদের মধ্যে শরৎও ছিলেন। এই অপরূপ কাব্য শুনে তাঁর কিশোর মন অজানা আনন্দে ভরে গেল। তিনি রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কিছুদিন পরে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"

উপন্যাস প্রকাশিত হল। শরৎ তা পড়ে খুব মুগ্ধ হলেন। তিনি নতুন ধরণের ভাষা ও গল্প রচনার সন্ধান পেলেন। বইখানি বারবার পড়লেন। তারপর আনন্দের প্রেরণায় পরম উৎসাহে উপন্যাস লেখায় মেতে উঠলেন। শোনা যায়, শরতের লেখা প্রথম উপন্যাসের নাম ছিল "বাসা"। সেই বইখানার পাণ্ডুলিপির সন্ধান পরে আর পাওয়া যায় নি। কেমন করে হারিয়ে গেছল—কেউ বলতে পারে না।

তিনি কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের নিয়ে ভাগলপুরে একটি সাহিত্য সভাও গড়ে তুলেছিলেন। কিছুদিন "ছায়া" নামে আর একখানি হাতে-লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তরুণ শরৎচন্দ্রের অন্তরে ছিল মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম নিবিড় শ্রদ্ধা আর সাহিত্য সেবার জন্য দুর্বার নেশা। যে বিশাল প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন, কিশোরকাল থেকেই তা নিজের প্রাণশক্তির জোরে অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছিল। অবশ্য যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁর জন্ম হয়েছিল তা তাঁর সাহিত্যসেবার পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। তবু কোন বাধাই তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করতে পারেনি। হিমালয়ের পাষাণ বুক চিরে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য বিরাট বৃক্ষ যেমন কঠোর সাধনা করে, তেমনি অনির্বাণ ছিল তরুণ শরতের সাধনা!

১৮৯৬ সালে আবার ঘনিয়ে উঠল ঘোর বাধা। ভুবনমোহিনী হঠাৎ মারা গেলেন। মতিলাল শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর মতন অসংসারী লোক স্ত্রীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতেন। জীবনের সেই ভিত্তি ভেঙে গেল। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন।

মনের সেই অবস্থায় শ্বশুরবাড়ির আশ্রয় ছেড়ে ভাগলপুরের প্রান্তে খঞ্জরপুরে গিয়ে নতুন বাসা করলেন। আবার শুরু হল দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম। এই সময় শরতের এফ-এ পরীক্ষা দেবার কথা। তিনি অর্থাভাবে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারলেন না, পড়াশোনা ছেড়ে দিলেন। ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁর চারিদিক নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে গেল। অভাবের সংসারে বাবার দারুণ কষ্ট দেখে তিনি একজন বিহারবাসী জমিদারের কাছে চাকরি নিলেন। জমিদার তরুণ শরতের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতে লাগলেন। শরৎ এই চাকরি করবার সময় ঘোড়ায় চড়তে এবং বন্দুক ছুড়তে শেখেন। উড়ন্ত পাখি শিকারে ক্রমে তাঁর অসামান্য দক্ষতা জন্মেছিল। কিন্তু তিনি জমিদার শিবশঙ্কর সাহুর কাছে বেশিদিন থাকতে পারলেন না। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা দেখে তাঁর খেয়ালী স্পর্শকাতর মনে লেগেছিল দারুণ আঘাত। তিনি ভিতরে ভিতরে ঘোর অশান্তি ভোগ করছিলেন। সে অবস্থায় কোন কিছুতে বেশিদিন মন দেওয়া মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। অশান্তির চঞ্চলতায় তাঁর হৃদয়ে আবার জেগে উঠল পুরাতন পথের নেশা। মন কেবলই কেঁদে কেঁদে ব্যাকুলভাবে খুঁজছিল, কোথায় সুখ, কোথায় আনন্দ, কোথায় মনের মত পরিমণ্ডল! ক্রমে চাকরির বাঁধা-ধরা একটানা বাঁধন তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। অকস্মাৎ একদিন বাহ্যতঃ বিনা কারণে ছেড়ে দিলেন চাকরি।

এই সময়ে আর একটা অঘটন ঘটল। মতিলাতের শখ ছিল পথ ও প্রান্তর থেকে নানা রঙের নানা আকারের পাথর কুড়িয়ে

এনে জমানো। তাঁর ধারণা ছিল, সেই পাথরগুলি খুব দামী এবং দুর্লভ জিনিস। তাই কিছুতেই তা হাতছাড়া করতে চাইতেন না। শরৎ একদিন খেয়ালবশে সেই পাথরগুলি একজন বন্ধুকে দান করে বসলেন। দু'চারদিন পরে মতিলাল সব জানতে পেরে ভীষণ মর্মাহত হলেন। তিনি আদরের পাথগুলির শোকে প্রাণের চেয়ে প্রিয় বড় ছেলেকে নিদারুণ তিরস্কার করলেন। অভিমানী শরৎ তা সহ্য করতে পারলেন না ; অভিমানের জ্বালায় সেই রাত্রেই চুপি চুপি গৃহত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

এবার সত্যিকার যাযাবর। শরতের মনে জেগেছিল সংসারের উপর গভীর বিতৃষ্ণা। জীবন যেন শূন্যময়। পৃথিবী যেন মরুভূমির মত। তাঁর পথ চলার কোন স্পষ্ট লক্ষ্য নেই, নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল নেই। শরৎ পায়ে হাঁটার পথে নিরুদ্দেশে এগিয়ে চলেন গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, দেশ থেকে দেশান্তরে। পরণে গেরুয়া কাপড়, চুল রুক্ষ, গালে দাড়িগোঁফ। মুখে হিন্দী ভাষা। পথ চলতে চলতে তিনি উঁচু নীচু নানা শ্রেণীর লোকের সংস্রবে এলেন।

শরৎ ঘুরতে ঘুরতে একদিন মজঃফরপুরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রবাসী বাঙালীদের ছিল একটি মজলিস। তরুণ সন্ন্যাসী সেই আড্ডায় এসে একজন সভ্যকে হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে দোয়াত কলম পাওয়া যাবে ?

—পাওয়া যাবে। ভিতরে এসে বসুন।

সভ্যটি ক্লাবের দোয়াত-কলম এনে সাধুকে দিলেন। সাধু তাঁর ঝুলি থেকে একখানি পোস্টকার্ড বের করে চিঠি লিখতে

লাগলেন। কৌতূহলী সভ্য উঁকি মেরে দেখলেন, পত্র-লেখক বাংলা ভাষা লিখছেন। তাঁর কৌতূহল বেড়ে গেল। তাঁর সঙ্গীরাও উৎসুক হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন, এই অপরিচিত দরবেশ নিশ্চয়ই জাতে বাংলাভাষী। কে ইনি? ক্রমে সাধুর সঙ্গে তাঁদের আলাপ জমে উঠল। আলাপ প্রসঙ্গে একজন হঠাৎ সাহসভরে বলে উঠলেন, আচ্ছা সাধুজী, আপনি আমাদের সঙ্গে হিন্দী ভাষায় কথা বলেছেন কেন? আপনি তো বাঙালী।

শরৎচন্দ্র ধরা পড়ে গিয়ে হেসে ফেললেন। তারপর দু' পক্ষের মধ্যে অন্তরঙ্গ ভাব জমে উঠল। সন্ন্যাসীর ব্যবহার বড় সৌজন্য ভরা। তিনি অপূর্ব গলায় মিষ্টি ভজন ও বৈষ্ণবপদাবলী গান করেন। মজঃফরপুরের অধিবাসীরা তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে গেলেন! তাঁরা পরম যত্নে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র প্রথম প্রথম থাকতেন স্থানীয় ধর্মশালায়। তারপর বিখ্যাত মহিলা কথাশিল্পী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর বাড়ির লোকেরা তাঁকে সযত্নে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে আসেন। তাঁর গানের সুনাম ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রায়ই গানের আসর বসতে লাগল। এমনি এক আসরে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত মহাদেব সাহুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ হয়। মহাদেব সাহু তাঁকে বিশেষ আদর করে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখেন। শরৎচন্দ্রের কয়েক মাস সেখানে খুব নিশ্চিন্তে কাটতে লাগল। তাঁর অন্তরে অশান্তির জ্বালা ক্রমে কমে এল। ধীরে ধীরে তাঁর মন শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণায় মেতে উঠতে লাগল। তিনি একখানি উপন্যাস লিখে ফেললেন, নাম "ব্রহ্মদৈত্য"।

সংসারে সকলের সুখ হয় না। শরৎচন্দ্র তা জানতেন। তবু সব মানুষ পেতে চায় মোটা ভাত, মোটা কাপড় আর থাকবার আশ্রয়। তাঁর সে সংস্থানও ছিল না। মনে ঘোর অশান্তি আর চঞ্চলতা। কোথাও যে চাকরী করে পয়সা রোজগার করবেন তার উপায় নেই। নিজেই নিজের শত্রু। এই অবস্থায় মহাদেব সাহুর কাছে একটা স্নেহের আশ্রয় পেয়ে শরৎচন্দ্র যেন নিজেকে একান্ত নিরাপদ মনে করতে লাগলেন। এমন সময়ে হঠাৎ খবর এসে পৌঁছল, মতিলাল ভাগলপুরে মারা গেছেন। তখন ১৯০৩ সাল।

চকিতে শরৎচন্দ্রের মন অসহায় ছোট ছোট ভাইবোনদের ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠল। বাবা নেই, আজ তারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। তিনি ভাইবোনদের নিজের প্রাণের মত ভালবাসতেন। তাই তাদের দুর্দিনে নিজের সব বৈরাগ্য মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আপন কর্তব্য করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি কিছুদিন আগে একখানা সাইকেল কিনেছিলেন। যেদিন বাবার মৃত্যু সংবাদ পেলেন, সেইদিনই সাইকেল করে ভাগলপুরে চলে এলেন।

হাতে পয়সা নেই, বাবাও কোন সম্পত্তি রেখে যেতে পারেন নি। শ্রাদ্ধের খরচ যোগানো শরৎচন্দ্রের পক্ষে প্রায় অসাধ্য কাজ। তিনি এই বিপদের দিনে নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। তবু সাহসে বুক বেঁধে সব কর্তব্যকর্ম করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। শরৎচন্দ্র দামী নতুন সাইকেলটি জলের দামে বেচে সেই টাকায় যথারীতি বাবার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করলেন।

তারপর কঠোরতর দারিদ্র্য ঘনিয়ে উঠল। বাড়িতে ছোট ভাইবোনকে দেখাশোনা করবার লোক ছিল না। তাদের প্রথমে চাই আশ্রয়, তারপর খরচের টাকাকড়ি। শরৎচন্দ্র এক ভাইকে আসানসোলে একজন আত্মীয়ের বাড়িতে রাখবার ব্যবস্থা করলেন। আর একভাই জলপাইগুড়িতে অপর একজন আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় পেল। তাঁরা খঞ্জরপুরের যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেই বাড়ির মালিকের স্ত্রী শরৎচন্দ্রের ছোট বোনকে খুব ভালবাসতেন। তিনিই এবার সেই ছোট মেয়েটিকে লালন-পালনের ভার নিলেন।

এই সব ব্যবস্থার পর শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। চাকুরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, এবার বৈরাগ্যের পালা তাঁর জীবনে শেষ হয়েছে। বর্তমানে কয়েকটি নাবালক অসহায় প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সে-সব চেষ্টার ফল বিশেষ কিছু হল না। তিনি কোথাও স্থায়ী কাজ পেলেন না। মুখচোরা তরুণ যুবক, শিল্পীসুলভ মন, স্বভাবতঃ অল্প আঘাতে ভেঙে পড়েন। মেয়েদের মত নিতান্ত অভিমানী। কলকাতার মত প্রকাণ্ড শহরে লোকেরা আপন আপন স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। কে এই তরুণ শিল্পীকে সমাদর করবে, সাহায্য করবে, কাজ দেবে! শরৎচন্দ্র জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা তো সহ্য করতে পারেন না। তিনি চান মনের শান্তি, সমাজের সমাদর, নিরাপদ স্নেহের আশ্রয়। শুধু খাওয়া-পরার নিশ্চিন্ততা নয়। তার সঙ্গে চাই তাঁর শিল্পী মনের উপযোগী আত্মবিকাশের পরিমণ্ডল। কলকাতায় একটির

পর একটি দিন বৃথা চলে যায়। শরৎচন্দ্রের মন গভীরতর হতাশায় হাহাকার করে ওঠে। জীবনের চারিদিকে ঘন কুয়াশার অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দিশেহারা পথিকের পক্ষে পথের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য। কোন্ দিকে গেলে এই হতাশার সাগরে কূল পাওয়া যাবে? কে আজ হবেন তাঁর জীবন তরীর কাণ্ডারী? কোথায় আলো, কোথায় নিরাপদ বন্দর? তীব্র ব্যাকুলতায় তাঁর দিন কাটতে লাগল।

ঁা মরা ইঁদুর পাওয়া

॥ দুই ঃ ফুলফোটার পালা ॥ ঙ্গ শহরের বাড়ি

এমান অবস্থার মধ্যে হঠাৎ একদিন শরৎচন্দ্রের ারুপায় হয়ে একজন দূর সম্পর্কের মেশোমশাই-এর কথা। শ্রীযুক্ত ং মিত্রদের চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেঙ্গুনের বিখ্যাত আইনজীবী। বহুদিন তিনি একবার ভাগলপুরে বেড়াতে এসে মতিলালকে বলেছিলে। শরৎ পাশ করলেই তাকে আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন। বর্মা ভাষাটা শিখিয়ে নিয়ে ওখানকার উকিল করে দেব। অনেক পয়সা রোজগার করতে পারবে। আজ মেশোমশাই-এর সেই পুরাতন, ফাঁকা, সাধারণ আশ্বাসবাণী অসংসারী তরুণ যুবকের মনে অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়ে তুলল। তিনি যেন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে নতুন আশার রেখা দেখতে পেলেন। এই ঘোর দুর্গতির মধ্যে এর চেয়ে সৌভাগ্যের সুযোগ আর কি হতে পারে! শরৎচন্দ্র মেশোমশাই-এর ঠিকানা জানতেন না। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়ে জেনে নেবার মত ধৈর্য তাঁর হল না। শরৎচন্দ্র নতুন আশায় বুক বেঁধে গোপনে রেঙ্গুন যাত্রা করলেন। তখন তাঁর বয়স ২৭ বছর।

রেঙ্গুন শহরে অনেকেই অঘোরচন্দ্রের নাম জানত। শরৎচন্দ্র লোকের কাছে সন্ধান করে মেশোমশাই-এর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। অঘোরচন্দ্র ছিলেন মেজাজী, মিশুকে লোক। আচারে ব্যবহারে পুরো সাহেব। শহরে য়ুরোপীয়, বর্মী, ভারতীয় প্রভৃতি নানা জাতের যত বড় লোকের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল। টাকা জমিয়ে বড় লোক হবার চেয়ে বড় মানুষী করে জীবনটা ভোগ

পর একটি দিন বুঝোঁক ছিল বেশি। মেশোমশাই এবং মাসীমা হাহাকার করে ক প্রথম প্রথম খুব আদর যত্ন করতে লাগলেন। সেই অন্ধকহার ফলে তিনি বর্মীভাষা শিখে পরীক্ষা দিলেন। দুঃসাধ্য। কায় কৃতকার্য হতে পারলেন না। তাঁর আইনজীবী যাবে? আশা আপাততঃ নিষ্ফল হল। অঘোরচন্দ্র তখন শরৎচন্দ্রকে আ চাকরি খুঁজে দেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। একদিন তিনি বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে এসে বললেন, শরৎ, আমার এক বন্ধু সাহেবের সঙ্গে সব কথাবার্তা বলে এসেছি। পরের সপ্তাহে তোমাকে নিয়ে গিয়ে একেবারে কাজে বসিয়ে দিয়ে আসব।

শরৎচন্দ্রের মন আনন্দে নেচে উঠল। তিনি ভাবলেন, বছর কয়েক ধরে কি ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে না কাটছে। এবার বুঝি দুঃখের অবসান হল। শরৎচন্দ্র কঠোর পরিশ্রম করতে অনিচ্ছুক নন। কিন্তু তাঁর একান্ত ইচ্ছা মনের মত কাজ পাওয়া। তিনি চান এমন মনিব এবং এমন কাজ—যাঁর কাছে তাঁর আত্মসম্মান বোধে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা নাই, যেখানে বড়লোকের হীন খোশামোদ করাই কাজ বজায় রাখার প্রধান কৃতিত্ব নয়।

কিন্তু মানুষ আশা করলেই কি তা সব সময়ে ফলে। শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্যের তখনও বাকি ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে হঠাৎ অঘোরচন্দ্র মারা গেলেন। তাঁর মরণের পর খবর পাওয়া গেল, তিনি রেখে গেছেন বিপুল দেনা। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রীকে সব বাড়িঘর, বিষয়-সম্পত্তি পাওনাদারদের হাতে ছেড়ে দিতে হল। তরুণ শরৎচন্দ্রের শেষ আশ্রয়ও ঘুচে গেল। তিনি নিরাশায় আবার শূন্য হাতে পথে বার হলেন।

সেই বিদেশে নিরাত্মীয় মগের মুল্লুকে কে তাঁর মরা ইঁদুর পাওয়া দেশে সবাই তাঁকে অবজ্ঞা করে বলত, ছিঃ ছিঃ্র শহরের বাড়ি কাজে মন বসে না। প্রবাসে বাড়িতে ডেকে নিয়ে নিরুপায় হয়ে ছিঃ ছিঃ বলবার মতও কোন আপন জন ছিল না। শরৎঃ মিত্রদের ভিক্ষুর বেশে কয়েক মাস বর্মার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়া কিন্তু তাঁর তো সত্যিকার বিবাগী মন ছিল না। তিনি কাজ কর্ক। চান, সংসার বাঁধতে চান, নিশ্চিন্তে বসে পড়াশুনা, সাহিত্যচর্চা করতে চান। উদাসীন ভিক্ষুর জীবনে সে সব করা তো সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্র উত্তর বর্মা থেকে আবার রেঙ্গুনে ফিরে এলেন। এবার তাঁর বাঙালী বাউলের বেশ। তাঁর মুখে বাউলের গান শুনে বর্মা সরকারের একজন বাঙালী অফিসার মুগ্ধ হলেন, নাম শ্রীযুক্ত এম্. কে. মিত্র। তিনি ছিলেন ব্রহ্মদেশের ডেপুটি এক্সজামিনার অব অ্যাকাউন্টস্।

কয়েকদিনের মধ্যে তাঁরা বন্ধু হয়ে পড়লেন। দুজনেরই পরস্পরকে খুব ভাল লাগল। শ্রীযুক্ত মিত্র শরৎচন্দ্রকে বললেন, আপনি আমার বাড়িতে থাকুন। শরৎচন্দ্র রাজী হয়ে তাঁর বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। শ্রীযুক্ত মিত্রের পড়াশোনার খুব উৎসাহ ছিল। তাঁর নিজস্ব ছোট গ্রন্থাগারে দর্শন ও সাহিত্যের অনেক ভাল বই ছিল। তাঁর সংসর্গে শরৎচন্দ্রের ভিতরের স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগ খুব বেড়ে গেল। তিনি নানা বই পড়ে ফেললেন। শ্রীযুক্ত মিত্র অফিসে সারাদিন কাজ করতেন, সকাল সন্ধ্যা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নানা বই-এর সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, নানা সমস্যা নিয়ে দু'জনে তর্ক করে আপন আপন সংশয় দূর করার চেষ্টা করতেন।

পর একটি দিন ব পরের সংসর্গে পরম আনন্দে কাটতে লাগল। হাহাকার করে শ্রীযুক্ত মিত্রের চেষ্টায় শরৎচন্দ্র বর্মার অ্যাকাউন্টেন্ট সেই অন্ধক দপ্তরে কেরাণীর চাকরি পেলেন। এতদিনে তাঁর দুঃসাধ্য। শার অবসান হল।

যাবে সুখে দিন যায়। শরৎচন্দ্র ভাবলেন, এবার বুঝি তাঁর আ ন সৌভাগ্যের দিন এল। তিনি চাকরির অবসরে পড়াশুনা য়ে মেতে উঠলেন। শ্রীযুক্ত মিত্রের আদর যত্নে তাঁর থাকা খাওয়ার কোন অস্থুবিধা ঘটল না। সংসারের দিক থেকে শরৎচন্দ্র অগোছালো মানুষ ছিলেন। বিদেশে নিজে বাসা করে সংসার পাতা অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। তাই হয়ত তিনি চাকরি পাবার পরও মিত্রদের বাড়িতে থেকে গেছলেন। সরকারী কেরাণীর মাইনে তখন বেশি ছিল না। তা হোক্। শরৎচন্দ্র সেই আয়েই পরম সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি জানতেন, জীবনে তিনি ধনী হতে চান না, গুণী হতে চান। পৃথিবীতে বড় লেখক হতে গেলে শুধু প্রতিভা নিয়ে জন্মালেই হয় না। নানা বিষয়ে পড়াশোনা করে নিজের জ্ঞান বাড়ানো দরকার—নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করে অন্তরের শক্তিকে বিকশিত করা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত মিত্রের প্রভাবের গুণে শরৎচন্দ্র সেই শক্তি বৃদ্ধির সাধনায় মেতে উঠলেন। তাঁর জীবনের আকাশে আবার যেন নতুন ঋতুর উদয় হল। তাঁর মনে হল, জীবনে কোন দিন যেন এত আনন্দ ও শান্তি পান নি।

কিন্তু হঠাৎ পুনরায় ঘটল বিপর্যয়। শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবন এমনি বারবার ওঠানামায় ভরা। সে বছর রেঙ্গুন শহরে প্লেগ রোগের ভয়ঙ্কর প্রকোপ হল। পাড়ায় পাড়ায় লোক মরতে

লাগল। মিত্রদের বাড়িতে কয়েকদিন পর পর মরা ইঁদুর পাওয়া গেল। ইঁদুর প্লেগ রোগ ছড়িয়ে দেয়। শ্রীযুক্ত মিত্র শহরের বাড়ি ছেড়ে দূরে শহরতলিতে উঠে গেলেন। শরৎচন্দ্র নিরুপায় হয়ে কেরাণীদের একটি মেসে এসে বাসা বাঁধলেন। আপাততঃ মিত্রদের সঙ্গে যোগ রইল না।

সেই মেসে থাকতেন একজন সাহিত্যরসিক ভদ্রলোক। শরৎচন্দ্রের মন ছিল সঙ্গ-পিপাসু। একলা-একলা, নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে তাঁর ভাল লাগত না। তিনি মানুষকে ভালবাসতে চাইতেন, মানুষের কাছ থেকে ভালবাসা পেতেও চাইতেন। মেসের সাহিত্যরসিক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর নতুন বন্ধুত্ব হল। এই ভদ্রলোক মদ খেতেন। দেশ থেকে অনেক দূরে প্রবাসে একলা একলা থাকার জন্য নিজেকে ঠিকমত রাখতে পারেন নি। এঁর সঙ্গদোষে শরৎচন্দ্রও ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লেন।

যাঁরা বড় লেখক বা বড় শিল্পী হন, জীবনে যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সাধারণ মানুষের জন্য চিরদিন তাঁদের প্রাণে লুকিয়ে থাকে পরম মমতা। তাই প্রয়োজন হলে মানুষের জন্য তাঁরা পরম ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হন না। ছেলে বয়স থেকে মানুষকে গভীর ভাবে ভালবাসতেন বলেই শরৎচন্দ্রের লেখায় অমন অপরূপ রূপে মানুষের সুখ-দুঃখের কথা ফুটে উঠেছে। এই সময়ে তাঁদের মেসের কাছে এক বস্তিতে থাকতেন একজন গরিব ব্রাহ্মণ কারিগর। শরৎচন্দ্র তাঁকে কন্যাদান থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন। আমাদের সমাজে বেশির ভাগ মানুষ সংকীর্ণ মনের লোক। মহামানুষদের উদারতা এবং মহত্ত্ব তারা সহজে বুঝতে

পারে না। সেদিন রেঙ্গুনের ভদ্র বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই শরৎচন্দ্রের এই ত্যাগের যথার্থ সম্মান দিতে পারেন নি। তাঁরা নীচ ঘরে বিয়ে করার জন্য শরৎচন্দ্রের সংস্রব ধীরে ধীরে ত্যাগ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাতে দমে যান নি। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে নতুন বাসায় হাসিমুখে সংসার পেতেছিলেন। তাঁদের একটি সন্তানও হয়েছিল।

কয়েক বছর পরের কথা। আবার প্লেগ রোগ মহামারী রূপে রেঙ্গুন শহরে শুরু হল। মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় প্রথমে গরিবদের ময়লা বস্তিতে। শরৎচন্দ্র যে বাসায় স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস করতেন, তার চারপাশে ছিল এমনি বস্তি। সেইসব বস্তিতে লোক মরতে আরম্ভ করল। এ অবস্থায় শহর ছেড়ে নিরাপদ পল্লীগ্রামে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু শরৎচন্দ্র তা পারলেন না। রোজ অফিসে চাকরি করতে যেতে হবে—দূর থেকে আসা যাওয়া করার হাঙ্গামা অনেক। তাছাড়া বিদেশীর পক্ষে শহরের বাইরে সপরিবারে থাকা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। শরৎচন্দ্র অনেক ভেবেচিন্তে পুরাতন বাসাতেই থেকে গেলেন। তার কুফল অচিরে ফলল। হঠাৎ একদিন তাঁর বাড়িতেই প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দিল। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর ছেলে ও স্ত্রী মারা গেলেন। শরৎচন্দ্রের জীবনে আবার উঠল কালবৈশাখী ঝড়!

মানুষ মহাদুঃখকে অতিক্রম করতে পারে বলেই তার চরিত্রে মহত্ত্বের বিকাশ হয়। কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র শ্রীযুক্তা হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করলেন। তাঁর অশান্ত জীবনে এবার শুরু হল সুখ ও শান্তির পর্ব। তিনি রেঙ্গুন শহরের এক প্রান্তে আবার

বাসা বাঁধলেন। মন দিলেন ভুলে যাওয়া সাহিত্য সাধনায়। যথার্থভাবে সাহিত্য সাধনা করতে গেলে বাড়িতে একটি ছোট গ্রন্থাগার না থাকলে অস্থুবিধা হয়। সংসারে খরচ অনেক। অথচ শরৎন্দ্রের আয় কম। সেই কম আয় থেকে কিছু কিছু টাকা বাঁচিয়ে তিনি প্রায়ই মনের মত বই কিনতেন। ইতিমধ্যে একটি স্থুযোগ পাওয়া গেল। শরৎচন্দ্র খবর পেলেন, একজন সাহেব তাঁর নিজের ছোট গ্রন্থাগারটি বিক্রয় করবেন। তিনি সেই গ্রন্থাগারের বই কিনে বাড়িতে আনলেন। ক্রমে তাঁর নিজের একটি চমৎকার ছোট গ্রন্থাগার গড়ে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে বাসাটি আপন রুচির মত করে ফুলগাছ দিয়ে সাজালেন। পাখি পুষলেন। যখনই অবসর পেতেন, তন্ময় হয়ে পড়াশোনা এবং লেখার কাজ করতে লাগলেন। কখন কখন বা ছবি আঁকতেন।

এই সময়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। তখন রেঙ্গুনের বেশির ভাগ বাড়ি ছিল কাঠের তৈয়ারী। শরৎচন্দ্র একদিন রাত্রে বাড়িতে ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ ভীষণ চীৎকার শুনে জেগে উঠলেন। বুঝতে পারলেন, বাড়িতে আগুন লেগেছে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে স্ত্রীকে জোর করে নীচের রেখে এলেন। তারপর আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে একটি ট্রাঙ্কে শখের দামী দামী বই ভরতি করতে লাগলেন। এদিকে কাঠের সিঁড়ির নীচের ভাগে ইতিমধ্যে আগুন ধরে গেছে। তিনি ট্রাঙ্কটা ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিয়ে জ্বলন্ত সিঁড়ির মধ্যে খানিকটা নেমে এসে লাফিয়ে পড়লেন মাটিতে। সেই বাড়ির নীচের তলায় থাকত একঘর ধোবা। সে তার গাধাটাকে ঘর থেকে খুলে বাইরে এনেছিল, কিন্তু ছাগলটা আনতে ভুলে

গেছল। তখন আগুন তার ঘরখানিকে ঘিরে দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর ঘরের মধ্যে বাঁধা জানোয়ারটা প্রাণের ভয়ে কাতর হয়ে চীৎকার করছে। পশুপাখির উপর শরৎচন্দ্রের চিরদিন প্রবল মমতা ছিল। তিনি ছাগলটার কাতরানি শুনতে শুনতে আর স্থির থাকতে পারলেন না। অপরে বাধা দেবার আগেই চকিতে ঢুকে পড়লেন আগুন-ঘেরা ঘরের মধ্যে। সকলে তা দেখে হায় হায় করে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে মহামানুষ পরম স্নেহে পশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

॥ তিনঃ বিকাশ ॥

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর আত্মীয় বন্ধুরা কয়েকজন তখন 'যমুনা' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন, যমুনা পত্রিকায় তোমার লেখা ছাপতে চাই। তুমি আমাদের কথা দাও, রেঙ্গুনে ফিরে গিয়ে লেখা পাঠিয়ে দেবে। শরৎচন্দ্র রাজী হলেন। তাঁর লেখা 'রামের সুমতি' গল্প প্রথম যমুনায় ছাপা হ'ল। এর কয়েক বছর আগে তাঁর আর একটি গল্প 'কুন্তলীন পুরস্কার' পেয়ে কুন্তলীন গল্প সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখকের নাম ছিল না। সেই গল্পটির নাম "মন্দির"। তারপর শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতে তাঁর মামা ও বন্ধুদের উৎসাহে "ভারতী" মাসিকপত্রে পুরাতন লেখা "বড়দিদি" উপন্যাস ছাপা হয়েছিল। কিন্তু "যমুনা"য় "রামের সুমতি" প্রকাশিত হওয়ামাত্র বাংলা দেশে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। অনেক পাঠকের মনে জিজ্ঞাসা জাগল, কে এই অসামান্য শক্তিমান নতুন লেখক? কোনও লেখক তো এঁর আগে এমন গভীর ভাবে বাংলা ভাষায় গল্প-কাহিনী ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। ক্রমে "যমুনা"য় একে একে "পথনির্দেশ", "বিন্দুর ছেলে", "চরিত্রহীন" প্রভৃতি ছাপা হল। ১৩২০ সালের "ভারতবর্ষ" মাসিকপত্রে "বিরাজ বৌ" প্রকাশিত হল। তারপর "বড়দিদি", "বিরাজ বৌ", "বিন্দুর ছেলে", "পরিণীতা", "পণ্ডিতমশাই", প্রভৃতি বই-আকারে মুদ্রিত হল।

শিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবনে বহুদিনের প্রতীক্ষার পর এল সিদ্ধির বসন্ত ঋতু। সারা বাংলাদেশ ভরে তাঁর জয়ধ্বনি উঠল। কত সাহিত্য-অনুরাগী নরনারী এতদিনে খুঁজে পেলেন তাঁদের মনের মত কথাশিল্পীকে। এ-তো শুধু গল্প নয়, এ যেন সত্যিকার জীবনের ছবি। এমনই শরৎচন্দ্রের লেখনীর জাদু। তিনি সাহিত্য-অনুরাগী নরনারীর হৃদয়ের সূক্ষ্ম তারে তারে জাগিয়ে তুললেন হাসিকান্নার মধুর সুর। এর আগে আর কোন বাংলাদেশের লেখক আমাদের ঘরের কথা এত দরদের সঙ্গে শোনাতে পারেন নি।

কয়েক বছর ধরে রেঙ্গুনের জলহাওয়া শরৎচন্দ্রের বিশেষ সহ্য হচ্ছিল না। তাই তিনি বই থেকে মাসিক পর্যাপ্ত আয় হতেই সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এলেন। কলকাতা শহরের প্রান্তে শিবপুরে বাসা করলেন। তারপর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যসেবায় সমর্পণ করলেন। একে একে উপন্যাস লেখা শেষ হয়ে গেল। মনে হয়, এর অনেক আগেই তাঁর প্রতিভার যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত, কিন্তু তিনি ছোটবেলা থেকে নিজের রচনার শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। যত মন দিয়েই কোন গল্প লিখতেন না কেন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। কেবলই সন্দেহ হত, তেমন মনের মত ভাল লেখা তো হয় নি! তাঁর হৃদয়ে নিজের সম্বন্ধে এইরূপ বিনয়ের ভাব ছিল বলে তিনি যৌবনে কোনদিন লেখা ছাপাবার চেষ্টা করেন নি। তা না হলে, তাঁর অল্প বয়সের রচনার মধ্যেই যে গভীর সরসতা ও আশাতীত নূতনত্ব ছিল, তার ফলে ১৯১৩ সালের

অনেক আগেই তিনি অসামান্য সাহিত্যিক বলে সুনাম অর্জন করতে পারতেন।

শিবপুরে দশবছর কেটে গেল। শরৎচন্দ্র জীবনে বিখ্যাত লেখক হতে চেয়েছিলেন। এতদিনে সে বাসনা সম্পূর্ণ সফল হল। প্রায় সকলেই তাঁকে আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলে স্বীকার করে নিলেন। অনেক সময়ে অপরিসীম সফলতার সঙ্গে জাগে বিদ্বেষ এবং দুর্নাম। সে যুগের কোন কোন নীতিবাগীশ লোক শরৎচন্দ্রের সুনাম সহ্য করতে পারেন নি, তাঁরা তাঁর নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, শরৎচন্দ্র যে সব প্রধান প্রধান চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের অনেকেই সাধু এবং সৎ নয়। তাছাড়া, তাঁর বই পড়ে সাধারণ পাঠকের মনে সৎ চিন্তা জাগে না। কিন্তু বিচার করে দেখলে মনে হয়, এই নিন্দুকদের ধারণা ঠিক ছিল না। শরৎসাহিত্যের সেরা গুণ হচ্ছে, কথাশিল্পী চমৎকার ভাবে গল্পের কাহিনী সৃষ্টি করতে পারতেন। সে কাহিনী একবার শুরু করলে পাঠকের পক্ষে শেষ পর্যন্ত না পড়ে থাকা অসম্ভব। দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, লেখক কাহিনীর নরনারীকে এমন জীবন্ত মানুষের মত ফুটিয়ে তুলতেন যে, তাদের কথা পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়, তারা সবাই যেন আমাদের সামনে চলাফেরা করছে ;—তারা যেন আমাদেরই চারপাশের চিরদিনের জানা-শোনা মানুষ। শরৎসাহিত্যের তৃতীয় গুণ হচ্ছে, শিল্পীর হৃদয়ে ছিল মানুষের জন্য পরম ভালবাসা। তিনি মানুষের দুর্বলতার জন্য মানুষকে ঘৃণা করতেন না, সহানুভূতির সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করতেন। 'তাদের জীবনের দুঃখবেদনার গল্প উপন্যাসের

পর উপন্যাসে একান্ত দরদের সঙ্গে এঁকেছেন। তা পড়ে পাঠকের মনে কুচিন্তা জাগে না। বরং আমরা উচ্চ চিন্তার আলোয় মহৎ হয়ে উঠি,—পীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের ভালবাসতে শিখি।

শরৎচন্দ্র নিজেই এই অভিযোগ সম্বন্ধে বলে গেছেন: "নানা অবস্থা বিপর্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে পৌঁছয়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম তারা সকল ক্ষতি আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে,—ত্রুটিবিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ, তাকে আত্মা বলাও যেতে পারে, সে তার সকল অপরাধের চেয়ে বড়। আমার সাহিত্যরচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক্ মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—আমার লেখা কোনদিন যেন না এতবড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমর এই অপরাধ। * * * সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই; নিলে না,—নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদেরই বেদনা দিলে আমার মুখ খুলে। এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। * *"

বিরাট যশের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রচুর আয় বেড়ে গেল। ১৯১৯ সালে তিনি শিবপুর ত্যাগ করে চলে গেলেন হাওড়া জেলার সামতাবেড় গ্রামে, রূপনারায়ণ নদের তীরে। তিনি সেই

গ্রামে বাড়ি তৈরি করে বাস করতে লাগলেন। দোতলা বাড়িখানি দেখতে চমৎকার ছিল। সামনে ফুলের বাগান। ঢালু, উঁচু পাহাড়ের প্রান্তে একেবারে ধবধবে শাদা নদীর স্রোত। সামতাবেড় গ্রামে প্রকৃতির স্নেহাশ্রয়ে শরৎচন্দ্রের প্রায় আট বছর কাটে। তিনি শেষ বয়সে কলকাতায় একখানি বাড়ি তৈরি করান। কিন্তু গ্রামের মুক্ত আকাশ হাওয়া আলোর প্রতি তাঁর হৃদয়ে বরাবর একটি গভীর আকর্ষণ ছিল। তাই তিনি কলকাতা শহরের বদ্ধ পরিমণ্ডলে বেশি দিন সুখে থাকতে পারতেন না। যখন তখন সামতাবেড়ে চলে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। তিনি গ্রামের বাড়িতে অনেক কিছু শহর-জীবনের সাজসরঞ্জাম নিয়ে গেছলেন, কিন্তু শহুরে চাল নিয়ে যান নি। কথাশিল্পী সামতাবেড়ের বাড়িতে আপন খুশিতে কখন পড়তেন, কখন লিখতেন, কখন সামনের মাঠে বসে নদীর বুকে জলের খেলা দেখতেন, কখন-বা বাগানে গিয়ে ফলফুলের গাছ বসাতেন।

অকস্মাৎ আশাতীত সুনাম এবং সম্পদ পেলে সাধারণতঃ মানুষ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শরৎচন্দ্র তা হন নি। তাঁর চরিত্র ছিল চিরদিন অমায়িক, নিরহঙ্কার। তিনি মস্ত বড়লোক হয়েও বড় ছোট সকলের সঙ্গে দিলখোলা ব্যবহার করতেন। সকলেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করার পর তাঁকে নিতান্ত আপনজন বলে ভাবত। তাঁর চরিত্রে আরও একটি মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্যাতি বেড়ে যাবার পর থেকে নানা পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁদের পত্রিকায় লেখা দেবার জন্য শরৎচন্দ্রকে তাগিদ দিতেন। তাঁর পক্ষে লেখা প্রকাশ হওয়া মানে মোটা পারিশ্রমিক পাওয়া।

কিন্তু তিনি সাহিত্যিক জীবনের গোড়ায় বা শেষে কখনই টাকার প্রলোভনে অথবা বন্ধুত্বের খাতিরে যা হোক কিছু রচনা লিখে প্রকাশ করতে দেন নি। এ বিষয়ে তাঁর চরিত্রে ছিল অসামান্য সংযম এবং একগুঁয়েমি।

একবার একখানি পত্রিকার সম্পাদক দেখলেন, বারে বারে তাগিদ দিয়েও শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি লেখা পাঠান না। তিনি লেখা আদায় করার জন্য একটি ফন্দি ঠিক করলেন। তিনি আস্‌ছে মাসের পত্রিকা প্রকাশিত হবার কিছুদিন আগে একদিন শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়ে হাজির হলেন। তারপর কথা-শিল্পীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ চাকরকে দেখতে পেয়ে বললেন, ওরে বাড়ির ভেতরে মাকে বলে দিস্ আমি আজ দুপুরে এখানেই খাব আর বিকালে চা-ও খাব। তাঁর কথা শুনে শরৎচন্দ্র তো অবাক্! বললেন আমাকে না জানিয়ে এ কি বলছেন? আজ কি সারাদিন আমাদের বাড়িতেই কাটাবেন? তখন আগন্তুক সম্পাদক জবাব দিলেন হ্যাঁ, মনে মনে তাইতো ঠিক করে এসেছি। তুমি এখন তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে লেখাটা শেষ করবার চেষ্টা কর তো। আমি এই বৈঠকখানায় বসে রইলুম। সেই বিকালে চা খেয়ে আর তোমার লেখা নিয়ে একেবারে যাব। বুঝলে? লেখা না পেলে আজ আর উঠছি না।

দিন যায়। ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে দিকে জাগল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ বিদ্রোহ। শরৎচন্দ্র সে সময়ে শুধু সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। বাংলা দেশের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস হঠাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে

পড়লেন। তিনি বিলাস ছাড়লেন, ব্যবসা ছাড়লেন, টাকাকড়ি বিলিয়ে দিলেন জাতির সেবায়। শরৎচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন পরস্পর পরস্পরকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। চিত্তরঞ্জন যখন সেরা ব্যারিষ্টার হিসাবে লাখ লাখ টাকা উপায় করতেন, তখন কথাশিল্পীকে তাঁর পরিচালিত "নারায়ণ" মাসিকপত্রে একটি গল্প দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র "স্বামী" গল্পটি রচনা করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁর হাতে একখানা চিঠি এল, চিঠির সঙ্গে টাকার-ঘর-পূরণ-না-করা একখানি চেক। চিত্তরঞ্জন চিঠিতে লিখেছিলেন, যে অসামান্য শিল্পীর রচনা এবার "নারায়ণ" পত্রিকা বক্ষে ধারণ করেছে, তার মূল্য ঠিক করার দুঃসাহস আমার নেই। ব্ল্যাঙ্ক চেক পাঠালুম, আপনার ইচ্ছামত এতে টাকা লিখে নেবেন। এই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শেই শরৎচন্দ্র শেষে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেতে উঠলেন। তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হলেন।

অবশ্য শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত বেশিদিন কংগ্রেসের কাজে প্রত্যক্ষ-ভাবে লিপ্ত থাকতে পারেন নি। তিনি ছিলেন কথাশিল্পী। রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে নানা দলাদলি, ঈর্ষা ও অকারণ শক্তির অপচয়। শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম শিল্পীমন এই সব হীনতা সহ্য করতে পারে নি। তিনি কয়েক বছর পরে কংগ্রেসের কাজ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সংস্রব ছেড়ে দিলেও ত্যাগী নিপীড়িত দেশসেবকদের সঙ্গে তাঁর আজীবন যোগ ছিল। তিনি স্বাধীনতা

সংগ্রামের বহু কর্মীকে অর্থসাহায্য করতেন। কত যে কর্মীর অসহায় পরিবারকে বিপদে আপদে টাকা পাঠাতেন, তার হিসেব নেই।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের সেরা সময় ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২০ সাল। তিনি এই কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি সৃষ্টি করেন—"চরিত্রহীন", "গৃহদাহ", "দত্তা", "শ্রীকান্ত", "অরক্ষণীয়া" এবং "নিষ্কৃতি"। তারপর ১৯২৩ সালে "দেনাপাওনা" প্রকাশিত হয়। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বদেশের সেবা করে যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করে বিখ্যাত "পথের দাবী" উপন্যাস লেখেন। অবশ্য এই বইখানি কথাশিল্প হিসাবে খুব উঁচু দরের নয়। তবুও বলা যেতে পারে "পথের দাবী" হয়ত বাংলা সাহিত্যের এযুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা "আনন্দমঠ" ছাড়া আমাদের সাহিত্যে এমন সকল শ্রেণীর আদরের বই আছে কিনা সন্দেহ। শরৎচন্দ্র এর পরে "শেষপ্রশ্ন", "বিপ্রদাস" প্রভৃতি কয়েকখানি ভাল উপন্যাস লেখেন। কিন্তু বিচার করতে বসলে একথা স্বীকার না করে থাকা যায় না যে, ১৯২০ সালের পর তাঁর জীবনে আর তেমন বিকাশের আবেগ দেখা যায় না। তিনি আর নতুন নতুন ধরণের চরিত্র এবং কাহিনী সৃষ্টি করতে পারেন নি। মনে হয়, তাঁর সব রচনাগুলির ভিত্তিমূলে রয়েছে যেন তাঁর যৌবনকালের দেখা জীবন এবং নরনারী। এর একটি কারণ ছিল। যৌবনের কঠোর জীবন সংগ্রামের পর হঠাৎ তাঁর জীবনে এল চরম সিদ্ধি। তিনি দেশব্যাপী খ্যাতি পেলেন, আশাতীত সম্পদের অধিকারী হলেন। এই বিপুল

সাফল্যই হল তাঁর শিল্পী জীবনের উত্তরোত্তর বিকাশের শ্রেষ্ঠ বাধা। তিনি নিশ্চিন্তে বাঁধা-বরাদ্দ পরিমণ্ডলে দিন কাটাতে লাগলেন। প্রথম জীবনে তাঁর চরিত্রের মধ্যে ছিল যে ভবঘুরে ডানপিটে ছেলে, সে অকেজো হয়ে পড়ল। তাই পরবর্তী জীবনে শরৎচন্দ্র আর নিজেকে বাড়াবার জন্য সাধনায় মত্ত হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের মত নিত্য নতুন নতুন দেশ ও মানুষ দেখার আগ্রহে পৃথিবীর দিকে দিকে ঘুরে বেড়ান নি। তাই তাঁর শেষের দিকের বইগুলিতে ঘুরে ফিরে প্রায় একই ধরণের গল্প ও মানুষের ছবি এসে পড়েছে।

পরবর্তী জীবনে শরৎচন্দ্র যে আত্মবিকাশে উৎসাহহীন ছিলেন, তার আর একটি কারণ হয়ত তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গতা। তিনি বর্মাদেশ থেকে অসুস্থ হয়েই দেশে ফিরেছিলেন। অর্শ ব্যাধিতে চিরদিন কষ্ট পেয়েছেন। তার সঙ্গে যকৃতের অসুখও ছিল। তৃতীয়তঃ হয়ত আফিং খাওয়ার অভ্যাসের ফলে তাঁর মনের উৎসাহদীপ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে গেছল। শরৎচন্দ্র নিজেই মামা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, "দেখো, আজ তোমাকে আমার মনের প্রগাঢ় বিশ্বাসের কথা বলি। আমি জীবনে যদি কোন নেশা না করতাম ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি এর চেয়ে অনেক বড় লেখক হতে পারতাম। যখন দিনকতক ওটা খুব কমিয়ে আনি, তখন যে সব উপলব্ধি আমার মনে আসে, সেগুলো যে কতবড় তা ভেবে আমি অবাক্ হয়ে যাই। তখন আপসোসে আমার মনের যে কি অবস্থা হয় তা প্রকাশ করা সত্যিই শক্ত।"

শোনা যায় শরৎচন্দ্র মদ ত্যাগ করার জন্য আফিং অভ্যাস করেছিলেন। ফলে মদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন বটে

কিন্তু নতুন একটা বিষে আসক্ত হয়ে পড়েন। আফিং বড় সর্বনাশা জিনিস। ইংলণ্ডের একজন বড় কবিও এমনিভাবে আফিং খেয়ে খেয়ে একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছিলেন।

অবশ্য শরৎচন্দ্র পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুড়ো বয়সে বারবার আফিং ছেড়ে দেবার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে। তাঁর রাজদ্রোহমূলক "পথের দাবী" উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর চারিদিকে তো বিপুল সাড়া পড়ে গেছল। শরৎচন্দ্রের ধারণা হয়েছিল, এই বই লেখার জন্য ইংরেজ রাজসরকার তাঁকে ক্ষমা করবে না, নিশ্চয়ই কারাগারে বন্দী করে রাখবে। ইংরেজের জেলে তো আর আফিং পাওয়া যাবে না। তাই আফিং না খেয়ে যাতে তিনি জেলে থাকতে পারেন সেই উদ্দেশে আগে থেকে আফিং খাওয়া ছেড়ে দিলেন। কয়েকদিন পরে তাঁর সামান্য জ্বর হল। দিন কুড়ি জ্বর খুব বাড়ল। ডাক্তারেরা বললেন, টাইফয়েড অসুখ। সেই মত চিকিৎসা চলতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই জ্বর কমল না। সকলেই মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তারপর হঠাৎ একদিন কথায় কথায় চিকিৎসকের কানে গেল, শরৎচন্দ্র আফিং খেতেন, সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, তাই নাকি! এতদিন সে কথা আমাকে জানান নি কেন? নিমেষে সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল। চিকিৎসক বললেন, এ জ্বরকে 'অপিয়াম ফিবার' বলে। তিনি অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে রোগীকে অল্প অল্প আফিং খাওয়াতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠলেন।

১৯২২ সালের পর থেকে তাঁর সাহিত্য-জীবনের একটানা স্রোত

এগিয়ে চলেছিল। মাঝে ১৯২৭ সালে তাতে আসে একটি নতুন বন্যা। তিনি রচনা করেন "ষাড়শী" নাটক। "দেনাপাওনা" উপন্যাসখানি থেকে এই নাটক তৈরি হয়। নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাতুড়ীর প্রেরণায় "ষোড়শী" সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা হয়। এই নাটকখানি পেয়ে শরৎসাহিত্যের ভক্তেরা নতুন ক্ষেত্রে অমৃত রসের সন্ধান পেলেন। চারিদ্বিকে আবার সাড়া জেগে গেল। আজও ষোড়শী বাংলা সাহিত্যের একখানি যুগান্তরকারী শ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিখ্যাত।

॥ চার : শেষ ॥

মানুষহিসাবে শরৎচন্দ্র চিরদিন ছিলেন খুব অস্থিরমনা ও খেয়ালী। কিন্তু তিনি কবি মধুসূদনের মত তাঁর জীবনকে ব্যর্থ হতে দেন নি। শরৎচন্দ্রের জীবনে এমনই একটি সূক্ষ্ম সংযম-শক্তি ছিল। সেই সংযম-শক্তি, আর অপরিমিত শিল্পপ্রতিভার গুণে তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা শেষ পর্যন্ত ভাঙনের মূল হতে পারেনি,—বরং সেই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বাংলা-সাহিত্যে সোনার ফসল সৃষ্টি করার দক্ষতা লাভ করেছিলেন। ছোট বয়সে তাঁর হৃদয়ে ছিল বাড়ির বড়দের সাবধানতা ও বিধিনিষেধের প্রতি প্রবল বিদ্রোহ-ভাব। যৌবনে সেই বিদ্রোহ-ভাব পরিণত হয়েছিল জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করার আগ্রহে। তিনি বড় হয়ে শাস্ত্র পড়ে শাস্ত্রীয় উপদেশ মত নিজের জীবনকে গড়তে চান নি। শরৎচন্দ্র প্রাণের আবেগে সহজভাবে জীবন-মহাসাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন, আর নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে অকৃত্রিম দরদ দিয়ে মানুষকে দেখে গেছেন। যা হওয়া উচিত, তা-ই নিয়ে নিজের চারপাশে গণ্ডী কেটে বসে থাকেন নি। আমাদের সংসারে—জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে যা সহজভাবে হচ্ছে, তিনি তার মধ্যে মহিমার খোঁজ পেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সহস্র বাধা এবং চরম দুর্দশা ভোগ করেও নিজের প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেন নি। এ যুগের বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন অসামান্য মহামানুষ আর আছেন কিনা সন্দেহ।

শরৎচন্দ্র অকৃত্রিম মন দিয়ে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ভোগ করেছিলেন। তাই মানুষের মহিমার বিচিত্র কাহিনীতে তাঁর

লেখা ভরে আছে। তাঁর রচনা পড়ে আমরা আমাদের সমাজের চারপাশের মানুষদের ভালবাসতে শিখেছি। সাধারণতঃ আমরা যাদের সমাজের নীচু স্তরে দেখতে পাই, আমরা যাদের উপেক্ষা করে দূরে দূরে রাখতে চাইতুম, যেসব দুর্বল-প্রকৃতির লোককে হীন, পতিত বলে অবজ্ঞা করতুম, শরৎচন্দ্রের প্রেরণায় তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর প্রতিভার আলোকে বাঙালীর সমাজজীবনের নানা তুচ্ছ ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য মহিমময় হয়ে সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশিত হবার আগে আমরা অনেকেই জানতুম না যে, আমাদের চারিদিকের জীবন এত সুন্দর, এত রহস্যময়।

শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল ফুলের মত কোমল। চারপাশের মানুষের দুঃখদুর্গতি দেখে তার মনে জাগত গভীর বেদনা। শ্রীযুক্ত জলধর সেন একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "একদিন প্রাতঃকালে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেম। সেদিন রবিবার। আমি প্রায় প্রতি রবিবার শরতের বাসায় যেতাম। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত আটটা নটার সময় কলকাতায় ফিরে আসতেম। সেদিন প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে একরাশ মিলের ছোট বড় ধুতিশাড়ী ছড়ানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধবার আয়োজন করছে। শরৎচন্দ্র সমুখের টেবিলে অনেকগুলি আনি দুয়ানি সিকি গুনে গুনে রাখছেন। আমাকে দেখে বললেন, দাদা, আমি এই দশটার গাড়িতেই দিদির বাড়ি যাব। তা বলে আপনি চলে যাবেন না। আমি বললাম, দিদির বুঝি কোন ব্রতপ্রতিষ্ঠা আছে, তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছ? আর কাঙালী

বিদায়ের জন্য বোধ করি ঐ [illegible] ? শরৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, না দাদা, দিদির ব্রতপ্রতিষ্ঠা নয়। এই বলেই চুপ করলেন। আসল কথাটা যেন গোপন করাই তাঁর ইচ্ছা। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করায় শরৎ অতি মলিন মুখে বললেন, দাদা, দিদির গাঁয়ের আর তার চারপাশের গাঁয়ের গরিব-দুঃখী মানুষের যে কি দুর্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই, সে যে কি—! শরৎ আর কথা বলতে পারলেন না। তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।” শরৎচন্দ্র সেই সব কাপড় আর পয়সা গ্রামের গরিবদের মধ্যে দান করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু একদিন নয়, মাঝে মাঝে এমনিভাবে নিয়ে যেতেন।

তিনি চিরদিন ভাইবোনদের অপরিমিত ভালবাসতেন। তাঁর মেজ ভাই বড় হলে রামকৃষ্ণমিশনে যোগ দিয়ে সাধু হয়ে যান। কয়েক বছর পরে তাঁর ভীষণ অসুখ হয়। তিনি সমতাবেড়ে বড় ভাইএর বাড়িতে এসে বাস করতে থাকেন। তারপর দাদার কোলে মাথা রেখে মারা যান। শরৎচন্দ্র প্রথমে শোকে খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর বাড়ির সামনে রূপনারায়ণ নদের তীরে মেজভাইএর চিতাভস্ম সমাধিস্থ করে তার উপর একটি বেদী তৈরি করিয়েছিলেন। অনেক বছর পরে আমরা সমতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম। তখন আমরা দেখতে পাই সেই স্বচ্ছ পাথরের সুশ্রী বেদীটি। আমরা উৎসুখ হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এটা কি? শরৎচন্দ্রের চোখ দুটি প্রশ্ন শোনামাত্র ছলছল করে এল। তিনি বেদনার আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না।

আস্তে আস্তে মেজভাইএর মৃত্যুর কথা বলে মন্তব্য করলেন, যখন কিছু ভাল লাগে না এইখানে এসে দুদণ্ড বসে থাকি, মনে শান্তি পাই।

তিনি খুব অতিথি-বৎসল ছিলেন। যারা সমতাবেড়ের বাড়িতে যেতেন, তাঁদের সকলকে খুব আদরযত্ন করতেন।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হত, শরৎচন্দ্র মুখচোরা মানুষ ছিলেন। তিনি কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপের প্রথম দিকে একটু আড়ষ্টভাবে কথা বলতেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে প্রায় সে আড়ষ্টভাব কেটে যেত। মেজাজ ভাল থাকলে অনেক সময় অপূর্ব খোসগল্প বলতেন। তাঁর খোশগল্প এত চমৎকার যে শ্রোতারা ছোট ছেলেমেয়েদের মত না হেসে থাকতে পারতেন না! শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে খুব রসিক লোক ছিলেন,—যেমন ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। একটি গল্প আছে। সেদিন একটি অভিনয় গৃহে তাঁর "আঁধারে আলো" বইটির চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছিল। তিনি একখানা ঢালা বিছানা-পাতা বক্সে বসেছিলেন। ছবি শেষ হল, শরৎচন্দ্র বিদায় নেবার জন্য উঠলেন। কিন্তু জুতো পায়ে পরতে গিয়ে দেখলেন, একপাটি তালতলার চটি অদৃশ্য হয়েছে! সঙ্গীরা খোঁজাখুজি শুরু করে দিলেন। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। তখন শরৎচন্দ্র হতাশ হয়ে জুতোর অন্য পাটিটা বগলদাবা করে খালি পায়ে গাড়িতে উঠলেন। একজন সঙ্গী তাঁর এই কীর্তি দেখে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ পাটিটা অত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? এক পাটি জুতোয় তো কোন কাজ হবে না; এটাও বরং এখানে রেখে যান।

উত্তর এল, তুমি ক্ষেপেছ? চোরবেটা এখানেই কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে বসে সব দেখছে। আমি এ পাটি জুতোটা রেখে গেলেই সে এসে তুলে নেবে। আমি তার সে সাধে বাধ সাধব; শিবপুরে ফিরে যাবার পথে হাওড়ার পুল থেকে এই পাটিটা গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে যাব।

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ বছরটি কাটে রোগযন্ত্রণায়। ১৯৩৭ সাল। ডাক্তার অর্শব্যাধির জন্য তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করলেন। ফলে অর্শ ভাল হল, কিন্তু নতুন উৎপত্তি দেখা দিল। শরৎচন্দ্রের কপাল থেকে মাথা পর্যন্ত একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। এই যন্ত্রণার দরুন ক্রমশঃ তাঁকে লেখাপড়ার কাজ বন্ধ করতে হল। কিছুদিন পরে অল্প অল্প জ্বর হতে লাগল। শরৎচন্দ্র বুঝতে পারলেন, তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুললেন। এদিকে নানাভাবে চিকিৎসার আয়োজন চলতে লাগল। কিছুদিন পরে হঠাৎ জ্বর ভাল হল, কিন্তু তিনি পেটের মধ্যে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

শেষে সমতাবেড় গ্রাম থেকে তাঁকে কলকাতায় আনা হল। ডাক্তারেরা এক্স-রে করে বুঝলেন, পেটে কঠিন অসুখ হয়েছে, নাম কিংকিংস। কয়েক দিনের মধ্যে অস্ত্রোপচার না করলে রোগীকে বাঁচানো অসম্ভব হবে।

বিধিমত অস্ত্রোপচার হল। দেখা গেল, শরৎচন্দ্রের যকৃৎ একেবারে পচে গেছে। ডাক্তারেরা সাময়িকভাবে নল বসিয়ে রোগীকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা বারবার বারণ করে দিলেন, মুখ দিয়ে কিছু যেন খাওয়ানো না হয়। মুখ দিয়ে

খেলেই বমি আরম্ভ হবে তাহলে কিছুতেই মৃত্যু ঠেকানো যাবে না।

সেদিনটা ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ সাল। শরৎচন্দ্র নার্সিং হোমে ভোরবেলা থেকেই বমি করতে শুরু করলেন। শোনা যায়, কোন আত্মীয় রোগীর পীড়াপীড়িতে স্থির থাকতে না পেরে চুপিচুপি আফিং জলে গুলে মুখ দিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে এই বমি। ডাক্তারেরা খবর পেয়ে অনেক চেষ্টা করলেন, কোন ফল হল না। রোগযন্ত্রণায় কাতর কথাশিল্পী ধীরে ধীরে ইহসংসার থেকে চিরবিদায় নিলেন।

—২০ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

সমাপ্ত

ওরিয়েণ্টের ছোটদের মহামানুষ রচনামালা ঃ

ছোটদের বিদ্যাসাগর	—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়		॥৶০
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র	—চন্দ্রকান্ত দত্তসরস্বতী	...	১৲
মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর	—চন্দ্রকান্ত দত্তসরস্বতী	...	১৲
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র	—চন্দ্রকান্ত দত্তসরস্বতী	...	১৲
মহাকবি মাইকেল	—চন্দ্রকান্ত দত্তসরস্বতী	...	১৲
গান্ধী-কথা	—রঘুনাথ মাইতি	...	১৸০
নেতাজীর জীবনী ও বাণী	—নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ	...	১॥০
শ্রীরামকৃষ্ণের যাঁরা এসেছিল সাথে	—স্বামী অমিতানন্দ	...	২৲
ভারতীয় বৈজ্ঞানিক	—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ	...	২॥০
আমার দেশের মানুষ	—ধীরেন্দ্রলাল ধর	...	॥৶০
বন্দী জীবন	—ধীরেন্দ্রলাল ধর	...	২৲